অমর একুশের স্মৃতি ধারণ

মোঃ হাফিজুর রহমান
প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
শরণখোলা সরকারি কলেজ
শরণখোলা, বাগেরহাট।

যে আঘাত হেনেছে আমায় তা কেবল স্মৃতিতে নয় বরং হৃদয়ে গেঁথে রয়। উপকূলীয় শহরে বেড়ে ওঠা, আমি দেখেছি সর্বস্তরের মানুষ - শিক্ষার্থী, শিল্পী, রাজনীতিবিদ, শ্রমিক, কৃষক যারা কিনা – বিভিন্ন অমর একুশের সামাজিক আচারে অংশ নিয়ে থাকে। প্রতি বছর ২১ শে ফেব্রুয়ারী আসে, ভাষার অধিকারের জন্য ছাত্র-শ্রমিকরা যারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল তাদের স্মরণে প্রভাত ফেরিতে হাতে ফুল তুলে একুশের গান শুনতে পাওয়া যায় “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী/ আমি কি ভুলিতে পারি?” এবং একযোগে তারা শহীদ মিনারের দিকে অগ্রসর হয়।

এটি ছিল স্মরণীয় ও আধ্যাত্মিক সংযোগের পাশাপাশি শাসক শ্রেণীর নিপীড়ন ও স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, যা জনগণের সম্মিলিত ঐক্য দ্বারা প্রভাবিত। এতে অবাক হওয়র কিছু নেই যে শহীদ মিনার একটি পবিত্র ধর্মনিরপেক্ষ স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেখানে লোকেরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে জড়ো হত। যখনই সম্মিলিত কর্মের প্রয়োজন দেখা দেয় তখনই লোকেরা একুশের দিকে তাকিয়ে থাকে। একুশ তাদেরকে সম্মিলিত শক্তিবোধের উৎসাহ দিয়ে থাকে। এটি কেবলমাত্র জাতীয় পর্যায়ে স্বৈরাচারবিরোধী এবং সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলনের জন্য নয়, নির্যাতনের বিরুদ্ধে স্থানীয় বিক্ষোভের ক্ষেত্রেও এটি সত্য ছিল।

পর্যবেক্ষন করলে দেখা যায় যে বর্তমানে একুশের অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা স্পষ্টতই শোক ও শোকের ভাষা থেকে দূরে চলেছি। শাহাদতের সাতষট্টি বছর পরে ক্ষতির যন্ত্রণা হ্রাস পেয়েছে এবং মৃতদের জন্য আমাদের দুঃখ ম্লান হয়ে গেছে। অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে জাতিসংঘের স্বীকৃতি অর্জনের পর একের পর এক সরকার উদযাপনের ভাষা গঠনেও ভূমিকা রেখেছিল। যুবসমাজের কাছে এটির আবেদন দিনকে দিন হ্রাস পেতে চলেছে। স্মরণ করার যৌথ অনুশীলন দীর্ঘকালীন। এবং একুশের "উদযাপনগুলি" ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের এক কৌতুক রূপকে প্রতিবিম্বিত করে, যা প্রদর্শনীবাদ এবং মনোযোগ আকর্ষনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে: রাজনীতিবিদদের জন্য এটি একটি ফটোশালা; সেলিব্রিটিদের জন্য, তাদের ভক্তদের তারা তাদের ভাষা এবং দেশকে কতটা ভালবাসে তা দেখানোর একটি সুযোগ; সাধারণ মানুষের জন্য, এটি নতুন পোশাক পরার এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার জন্য ফটো তোলার সুবর্ন সুযোগ।

এই পরিবর্তনগুলির রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবগুলি কী কী? আমরা ইতিহাস এবং স্মৃতিশক্তিগুলির মধ্যে একটি বিভেদ তৈরি করার ঝুঁকির দিকে যাচ্ছি বলে মনে হয়।

আমরা সবাই জানি যে সম্মিলিত স্মৃতি সামাজিক পরিবর্তনকে সচল করতে পারে। স্মরণ করার কাজটি কেবল অতীতের ঘটনার প্রেক্ষাপটকেই উপস্থাপন করে না, বর্তমান প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করে এবং চালিত করে। যেকোন প্রয়োজনীয় প্রতিরোধকে সম্মিলিত স্মৃতির ভিত্তিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম করে তোলে। অন্য কথায়, লড়াই স্মৃতি ছাড়া অসম্ভব। আমাদের জাতীয় জীবনে, অমর একুশে একটি অনন্য স্থান দখল করেছে - কেবলমাত্র শিক্ষার্থী ও শ্রমিকদের শাহাদাত, আমাদের মাতৃভাষার দমন, এবং আমাদের সংস্কৃতিতে আঘাতের স্মারক হিসাবে নইয়, বরং সম্ভাবনার বোধ এবং সম্ভাব্য শক্তির প্ররোচনা দিয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে যখন আমরা অনুভব করেছি যে আমরা ইতিহাস রচনা করছি, বা সমাজের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য প্রতিটি সংগ্রামে একুশের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের স্মৃতি আমাদেরকে সচল করেছিল।

একুশের তাৎপর্য রাজনৈতিকের চেয়ে বেশি সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ছিল, তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এটি বাঙালি সমাজকে চিরতরে বদলে দিয়েছে। একুশের সেই দিনটি, যখন আমরা ঘোষণা করেছিলাম যে, এই ভাষাটি আমাদের, আমরা এই ভূমির অন্তর্ভুক্ত। সেইদিন প্রথমবারের মতো অনাগত বাংলাদেশের হৃদস্পন্দন শোনা গেল। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম স্পষ্ট প্রকাশ এই ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল। একুশের স্ব-অনুভূতি এবং অন্তর্ভুক্তির অনুভূতি গড়ে তুলেছিল যা সাধারণ মানুষের

গণতান্ত্রিক সংস্থাকে দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম করে তুলেছিল। এটি ছিল আমাদের জাতীয় অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এটি "পাকিস্তান মতাদর্শ" যা বিভাজনমূলক "দ্বি-জাতি" তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। অন্যদিকে, সাম্যতার নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে" বাংলাদেশ মতাদর্শ " নামে একটি নতুন সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল ,যেখানে মানব মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায্যবিচার ছিল। " একুশের প্রতিমূর্তি থেকে মুক্তি এবং সমতাবাদী চরিত্র বংশপরম্পরায় ধরে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের অনুপ্রেরণা ও প্রাণশক্তির এক নিয়মিত উৎস। এ কারণেই একুশের স্মৃতি ক্ষুন্ন করার প্রয়াস থেকে রক্ষা পাওয়া খুব জরুরি।

ভাষা আন্দোলনের একটি মূল নীতি হচ্ছে এটির সর্বজনীনতা: এই ধারণাটি থেকে বলা যায় পৃথিবীর সমস্ত মানুষের নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কৃতি অনুশীলনের অধিকার থাকা উচিত। এটি সমস্ত লোক এবং তাদের ভাষার জন্য কথা বলে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ১৭ ই নভেম্বর, ১৯৯৯ ইউএনও কর্তৃক ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে গ্রহণ করা আমাদের সকলকে গর্বিত করেছে এবং বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের মর্যাদাকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে। বিংশ শতাব্দীর পর থেকে বিশ্বজুড়ে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য প্রচারের জন্য জাতিসংঘের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তবে কিছু লোকের যুক্তি হতাশাজনক যে, যেহেতু একুশে এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃত, তাই আমাদের উচিত এটি শোকের দিন হিসাবে পালন না করে পুরো বিশ্বের সাথে আনন্দের সাথে উদযাপন করা উচিত। আমি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রাপ্তি উদযাপনের বিরোধী নই, তবে আমি দৃড়ভাবে বিশ্বাস করি যে শোক করা এবং স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য।

আমরা যদি শোক ছেড়ে , তবে শীঘ্রই আমরা অতীতের ঘটনা আর স্মরণ করতে পারব না। আমরা কীভাবে ঐতিহাসিক স্মৃতিটিকে জীবিত ও প্রাসঙ্গিক রাখার জন্য এগিয়ে যাই; আমাদের উত্তরাধিকারের উপলব্ধি এবং ব্যাখ্যা এটির উপর নির্ভর করে। আমরা যদি এই ঐতিহাসিক দিনের অর্থ সংরক্ষণ এবং সঞ্চারিত না করি, তবে আমাদের বীরাঙ্গনারা যে ইতিহাসের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন সেই ইতিহাসটি আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে আর স্পর্শ করবে না। এর অর্থ হ'ল আমরা এর অন্তর্ভুক্ত নই। আমরা এমন একটি জাতির অংশ যা আজ বিশ্ব মঞ্চে নিজের জন্য জায়গা তৈরি করেছে। আমরা যখন আমাদের এইরকম "অমর" স্মৃতি পেয়েছি তখন কীভাবে আমরা নিজের অনুভূতি ছাড়াই বা ইতিহাসবিহীন মানুষ হিসাবে এগিয়ে যাওয়ার কল্পনা করতে পারি?।

একুশের অনন্তকালীন প্রতিশ্রুতি এখনও পূরণ হয়নি। এটি এখনও প্রচুর প্রতীকী তাৎপর্য ধারণ করে যার একটি সম্মিলিত শক্তি জড়ো করার এবং বড় ধরনের পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রাখে। এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে অমর একুশে আন্তর্জাতিকভাবে পালিত হওয়ায় বিশ্বজুড়ে ব্যক্তিদের বৃহত্তর অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে।ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এটি জেনে রাখা জরুরি যে, আমাদের পুর্বপুরুসেরা তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করে জীবন দিয়েছে তবু মাথা নত করেনি এবং অনেক লোক এখনও লড়াই করছে।

সংশোধন এবং সংরক্ষণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কেবল শোক ও স্মরণ আমাদের সম্মিলিত স্মৃতির ক্ষয় বন্ধ করতে পারে।